উড়ালগদ্য- ১৬

কাজী জহিরুল ইসলাম

ট্র্যাশভিল রাত

দৃশ্যটা কিছুতেই মুছতে পারছি না।

হাত বাড়ালেই প্লাতু, পায়ের নিচে ট্র্যাশভিল। তার নিচে গ্রীস্মের হালকা বাতাশে কেঁপে উঠছে লেগুনের ফুলে ওঠা বুকের নীল, তারাদের প্রতিবিম্ব। পানিতে গুলিয়ে যাওয়া আলোর প্রতিবিম্ব জমাট বাঁধছে, আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকে প্রশস্ত রাস্তার ওপর হাজারখানেক চাকা স্থির। পুরোভাগে দু'জন মানুষ, পড়ে আছে পথের ওপর উল্টোদিকে মুখ করে। সারা পথ রক্তের নদী, ছেঁড়া শার্টে, ছেঁড়া জিনসে জবজবে রক্ত। মানুষ দুটোর হাত-পা কাঁপছে, ধর লাফাচ্ছে। মুখে মৃত্যুর ফেনা, ফুশ ফুশ শব্দ উঠছে বাতাশে। ওদের ঘিরে আছে একদল দর্শক, তামাশা দেখছে। কেউ ছোঁবে না মৃত্যুপথযাত্রী দু'জন মানুষকে। মুখোমুখি সংঘর্ষ। হোন্ডা একর্ডের সবগুলো জানালার কাচ সহস্র টুকরো হয়ে মাটিতে। পুঁজোর নাক-মুখ থেতলানো। অপেক্ষমান ভিড় দু'জন অসহায় মানুষের মৃত্যুদৃশ্য দেখছে। ভিড়ের গুঞ্জন ছাপিয়ে কারো আশঙ্কার কণ্ঠ উঠে এলো? কেউ কি চিৎকার করে বললো, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স? এখনো সময় আছে, হয়ত বেঁচে যাবে। না, কেউ ছোঁবে না। নিয়ম নেই। সড়ক দূর্ঘটনায় আহত গাড়ি কিংবা মানুষ কোনোটাই ছোঁয়া যাবে না, যতক্ষণ না পুলিশ আসছে। পুলিশই মেপে ঠিক করবে মৃত্যুর দূরত্ব।

কি সুন্দর নিয়ম দেখেন, দুই ড্রাইভার বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরিয়েছে। কোনো ঝগড়া নেই, তর্ক-বিতর্ক নেই। পুলিশ এসে নির্ধারণ করবে কার কি অপরাধ, কে কতোটা ফাইন দেবে। কর্নেল খালেক অবাক। অবাক আমিও। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া দ্বিধা-বিভক্ত আইভরি কোস্টের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ আইনের প্রতি কতোটা শ্রদ্ধাশীল। আশ্চর্য!

আজ সকাল থেকেই খারাপ খবর পাচ্ছি। অফিসে ঢুকেই ইয়াহু খুলে দেখি কবি সুমন রহমানের ইমেইল। সুমন লিখেছে, কবি মোস্তফা আনোয়ার মারা গেছেন। আজ সকালে। বুকের বাঁ দিকটা অজান্তেই খামচে ধরি। ওখানটা কেঁপে ওঠে, দূরে কোথাও প্রস্থানের ঘন্টা বাজে। আরো একটা রিমাইন্ডার।

এক্সেলেটরে পা কেঁপে উঠছে। ক্লাচ চাপতে গিয়ে মনে হয় জুতোর নিচে জমাট বাঁধা চাপ চাপ রক্ত, পা আটকে যাচ্ছে। লা মারিয়ামের স্যামন ফিশ পেটের ভেতর লেজ নাড়ছে। গাড়িতেই বমি হয়ে যাবে

নাকি? পাশের সীটে বসে টের পান ড. মিজানুর রাহমান, পানি বিশেষজ্ঞ। মন দিয়ে গাড়ি চালানতো ভাই, গিয়ার বদলান। তখনি খেয়াল করি আরপিএম চারে।

ইমেইলটা পড়েই ঢাকায় ফোন করি। ও তখন ঘুমুচ্ছে। ঢাকায় অনেক রাত, সাড়ে বারো। এলসিসি মিটিং থেকে ফিরেই মেইলটা পড়ি। বাইরের আকাশ বাদুড়ের ডানার ফাক দিয়ে লাল হচ্ছে। একটা রেখা দিন এবং রাত্রির মাঝখানে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আধঘন্টা লিফটে আটকে থেকে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করেছে মুক্তি। পাশে অগ্নি, কোলে জল। অগ্নি বারবার মায়ের চোখের কোলে জমে উঠা ঘাম অশ্রু ভেবে মুছে দিচ্ছিলো। অগ্নির চোখ টলমল করছে, ওর ছোট্ট বুক ভয়ে টিপটিপ করে কাঁপছে। গরমে চিৎকার করছে দু'বছরের জল। মুক্তি লিখেছে, আর দশ মিনিট থাকলেই সাফোকেটেড হয়ে মরে যেতাম। দায়িত্বজ্ঞানহীন কেয়ারটেকার লাপাত্তা, দারোয়ানদের কেউ জানে না কিভাবে আটকে যাওয়া লিফটের দরোজা খুলতে হয়। এলার্ম বাজছে অনবরত। ১৩টি ফ্ল্যাটের কেউ আসছে না। কেউ না কেউ গেছে নিশ্চয়ই, এ ভরসায় সবাই। টিপিক্যাল বাঙালী চরিত্র। ভাগ্যিস মোবাইলের নেটওয়ার্ক ছিলো। মুক্তি ফোন করে ঘরে, মাত্র দুটো ছাদ ওপরে, পাঁচতলায়। ছোট্ট পলিই তখন ভরসা। তিনতলায় ফোন করে জানায় বিপদের কথা। নূর আলম সাহেব ছুটে যান পাশের বাড়িতে, সাহায্যের খোঁজে। ধন্যবাদ নূর ভাই, আমার স্ত্রী-সন্তানদের এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য।

মোস্তফা আনোয়ার নাটকের শেষ দৃশ্যের একটা বর্ণনা দিয়েছেন সুমন রহমান। বুক উঠা-নামা করছে। কিন্তু তিনি নেই। ওটা যন্ত্র। এখানেও বুক উঠা-নামা করছে। ওটা জীবন। উঠা-নামা থেমে যাচ্ছে। ওটা নিয়ম।

আমি বাসায় ফিরছি। লা মারিয়ামের স্যামন। দুটো স্ট্রিট ঘুরে মোনালিসায় আইসক্রিম। মিজান ভাইকে দ্যু-প্লাতুতে নামিয়ে দিয়ে আবার ট্র্যাশভিল। উল্টোদিকের রাস্তা, ঠিক ওখানটা। দুটো মানুষ। ধর লাফাচ্ছে। রক্তে ভেজা শার্ট, রক্তে ভেজা প্যান্ট, রাস্তার বিটুমিন। হাসপাতালে নিলে বেঁচে যাবে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না। নিয়ম নেই। আবিদজান শহর নিবতে শুরু করেছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ। চাঁদের আলোয় গলছে লেগুনের নীল। রাতটা আরো দ্রুত হাঁটতে শুরু করে নির্জন অন্ধকারের দিকে। স্ট্রিট-লাইটগুলো মাছের চোখ, জেগে থাকা অসংখ্য রাতের গল্প।

আমি ঘুমুতে পারছি না। উঠে পানি খাই, পঁচ মিলিগ্রামের একটা ফ্রিজিয়াম। এটাও নিয়ম।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৭ এপ্রিল, ২০০৬